অপশক্তি তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা

অনিরুদ্ধ আহমেদ

এক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে তীব্র অসন্তোষ ও বিক্ষোভ লক্ষ্য করা গেছে, তাতে অস্বাভাবিকতা নেই মোটেও। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাসের কথাই বলুন কিংবা এই সেদিনের এরশাদবিরোধী আন্দোলনের কথা, ছাত্রছাত্রীরা যে এসব কিছুতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে সে তো আমাদের জানা ইতিহাস। এবারকার ছাত্রদের মধ্যে যে বিক্ষোভ-বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা গেল সেটার পেছনে হয়তো ছাত্রদের তরফ থেকে যুক্তি থাকতে পারে অনেক। তাছাড়া তারুণ্যের ধর্মই হলো প্রাতিষ্ঠানিক চেতনার বিরুদ্ধে দ্রোহী হওয়া। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসই বলুন কিংবা স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আন্দোলন যে অতীতে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সে ইতিহাসও আমাদের অজানা নয়। সেদিক দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভূত এ প্রতিবাদ বিক্ষোভে সরকার যে খানিকটা বিচলিত বোধ করেছে, সে কথা মানতেই হয়। একদিন বিলম্বে হলেও সরকারের তরফ থেকে এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ, জাতির উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টার ত্বরিত ভাষণ এবং অভিযুক্তদের বিষয়ে তদন্তের আশ্বাস এ ঘটনার একটা নিষ্পত্তি সাধন করতে পারত সহজেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ বিক্ষোভ প্রশমিত হলো না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল প্রায় অনেক বড় বড় শহরে, এতে এক ধরনের অরাজকতাও সৃষ্টি হলো, শহরগুলোর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হলো। ক্যাম্পাসের বাইরে ছড়িয়ে পড়া এ বিক্ষোভ নিয়েই সমস্যাটা প্রকট আকার ধারণ করল। সে ঘটনাটি যেমন ছিল অভাবিত, তেমনি অনভিপ্রেত। বিক্ষোভ যে শুরু হয়েছিল ক্যাম্পাসের ভেতরে সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে এ বিক্ষোভের সম্প্রসারণ নিয়েই নানা তত্ত্ব ও তথ্য আসছে, যার সবটাই যে গ্রহণযোগ্য সে কথা বলা মুশকিল। তবে গোটা বিষয়টাই যে ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ক্যাম্পাসের বাইরের কোনোরকম আন্দোলন, উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সঙ্গে যে ছাত্র-শিক্ষকের কোনো সংযোগ ছিল না সেটা বেশ বোঝা যায়। ক্যাম্পাসের বাইরে ঢাকা শহর এবং অন্যত্র যে এক ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি হলো সে বিষয়ে নানা রকমের তত্ত্ব রয়েছে।

দুই : একটি তত্ত্ব হচ্ছে ক্ষোভ ও অসন্তোষ তত্ত্ব। অনেকেই মনে করছেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, চাকরির অভাব, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছ থেকে বিপুল প্রত্যাশা পূর্ণ হতে না পারা এবং সরকারের নিরপেক্ষতা প্রশ্নসাপেক্ষ হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে এ সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। এ অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশের প্রথম সুযোগটিই হাতছাড়া করতে চায়নি ক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠী, কোনোরকম ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক ধরনের আন্দোলনে। বস্তুত এ ঘটনায় আকস্মিকতা ছিল, ছিল স্বতঃস্ফূর্ততাও। কোনো রাজনৈতিক দলের স্লোগান, ব্যানার এগুলো কিছুই ছিল না সাম্প্রতিক ওই বিক্ষোভে। সেজন্যই কেউ কেউ বলছেন, বিষয়টি ছিল নিছক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানানো। প্রতিবাদ বিক্ষোভটি নিঃসন্দেহেই প্রকৃতিতে ছিল রাজনৈতিক, আকৃতিতে ছিল যথেষ্ট চোখে পড়ার মতোই। কিন্তু রাজনৈতিক হলেও এটি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে আয়োজিত, তেমনটি মনে না করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তবে এ তত্ত্বের সমর্থকরা বস্তুত এ কথাই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, এ উষ্মা প্রকাশটি ছিল স্বাভাবিক। দ্বিতীয় তত্ত্বটি হচ্ছে 'অপশক্তি তত্ত্ব'। এ তত্ত্বের প্রবক্তা স্বয়ং তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অপশক্তি শব্দটির কোনো পরিষ্কার ব্যাখ্যা সরকার এখনো দেয়নি, যদিও এখনো অঙ্গুলি নির্দেশিত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রদের প্রতি তবু এরা যে অপশক্তি সে কথাও সরকার স্পষ্ট করে বলছে না। এদিকে তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান পরিষ্কার বলেছেন, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণে এমন কিছুই পাওয়া যায়নি যাতে মনে হয় যে শিক্ষকরা এ গোলযোগের পেছনে ইন্ধন জুগিয়েছেন। শিক্ষকরা মূলত অভিভাবকের মতোই, কেবল ছাত্রদের নয়, তারা এক অর্থে জাতিরও বিবেক। তাদেরই সন্তানতুল্য ছাত্ররা কোনোভাবেই নিপীড়িত হোক সেটা তারা চান না কখনোই। কাজেই শিক্ষক সমিতি তাদের সভায় যদি ছাত্রদের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সেটি নিয়েছে একটি সংগঠন হিসেবে এবং ব্যক্তিগতভাবে নয়। তাহলে অপশক্তি কারা? অনুমান করা হয় কারো না কারো আশীর্বাদপুষ্ট কিছু কিছু মিডিয়া এ অপশক্তিকে চিহ্নিত করেছে ক্ষুব্ধ রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে। কোটি কোটি টাকা ছড়ানোর কথাও বলা হচ্ছে। এ কথা সত্যি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বিক্ষোভ ও গোলযোগ যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং তা যে প্রায় দাবানলের মতো গোটা রাষ্ট্রকে গ্রাস করে নিত তাতে কোনো সংশয় নেই। আর এ রকম ব্যাপক সহিংস গোলযোগ ছড়ানো ছাত্রছাত্রীদেরও আওতার বাইরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন এবং ক্ষোভ অধিকাংশ সময়ই সীমাবদ্ধ থেকেছে, নীলক্ষেত, দোয়েল চত্বর, বড়জোর চারুকলা ইনস্টিটিউট পর্যন্ত। তবে যেভাবে সাতমসজিদ রোড কিংবা মিরপুর রোডে ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে এবং সাধারণ লোকের সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে তাতে কোনোক্রমেই এটা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়, এ কাজটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীরা করেছে। অতএব, ব্যাপারটির সঙ্গে যে ছাত্র-শিক্ষক জড়িত নন, সেটার জন্য বস্তুত কোনো অনুসন্ধান বা তদন্তের

প্রয়োজন পড়ে না। এক পর্যায়ে মনে হলো যে, অপশক্তি বলতে পরোক্ষভাবে সরকার রাজনীতিক এবং কিছু ব্যবসায়ীকে বোঝাতে চেয়েছে। এ কথাও ব্যাপকভাবে প্রচার পেয়েছে, অসৎ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী ও রাজনীতিকরা তাদের স্বার্থহানি ঘটার কারণে, সরকারকে বিব্রত করতে এ ধরনের কাজ করেছে। এ তত্ত্বটি এখনো প্রমাণসাপেক্ষ, কারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ ব্যাপক অভিযানের মুখে গোয়েন্দারা যখন তাদের তৃতীয় নয়ন দিয়ে সব দেখতে চাইছে, ঠিক সেই সময়ে কোটি কোটি টাকা ছড়ানো হলো গোলযোগের জন্য, আর কেউ কিছু জানল না, বুঝল না, সেটা কেমন ধরনের কথা!

তিন : অপশক্তি তত্ত্বের আরেকটি দিক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে দু'একটি পত্রিকায়। তারা আবার গোয়েন্দা সংস্থার সূত্র উল্লেখ করে লিখেছে, বাংলাদেশের একজন মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ব্যক্তি নাকি ভারতের কাছ থেকে অর্থ এবং পরামর্শ নিয়ে বাংলাদেশে লংকাকাণ্ড বাধিয়েছেন। বাংলাদেশের এসব সংস্থা যদি এত মারাত্মক একটা তথ্য পেয়েই থাকে, তাহলে আগেভাগে এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার ব্যর্থ হলো কেন? নাকি এ কেবল কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নন্দঘোষ বানানোর জামায়াতি প্রয়াস? আসলে এ বিষয়েও সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী একটি গোষ্ঠী একজন মুক্তিযোদ্ধাকে, যিনি বস্তুত ঘাতক-দালালদের বিরুদ্ধে এক ধরনের জিহাদ ঘোষণা করে রেখেছেন, পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে তার দেশপ্রেমকে প্রশ্নসাপেক্ষ করার চেষ্টা করছে কি-না। এটা মনে রাখা উচিত, মৌলবাদী ও স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামী ১১ জানুয়ারির পরিবর্তনের সুযোগ নিচ্ছে এবং সম্ভবত সরকারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা এ পরিবর্তন থেকে ফায়দা পাওয়ার চেষ্টা করছে। পরিহাসের ব্যাপার হলো এই যে, এর পূর্ববর্তী সরকারের অংশ হিসেবে জামায়াতে ইসলামী পূর্ণাঙ্গ সুবিধা পেয়েছে অথচ এ পরিবর্তনে যখন দুটি প্রধান দল সমস্যার মুখোমুখি তখন আবার তারাই নীরবে এ শূন্যতার সুযোগ নিচ্ছে। মনে রাখা প্রয়োজন, এ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সেনাপ্রধান জেনারেল মইন উ আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বিরুদ্ধে পরিষ্কার ও কঠোর বক্তব্য রেখেছিলেন। কাজেই এটা হয়তো বিচিত্র নয় যে, তারা এখন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এবং আরো শক্তিশালী করার কৌশলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে এ অপপ্রচার চালাচ্ছে। প্রশাসনের মধ্যেও ঘাপটি মেরে বসে থাকা এসব জামায়াতি লোক তাদের বাহ্যিক সততার অন্তরালে রাজনৈতিক শঠতা কার্যকরে সচেষ্ট থেকেছে বরাবর। কাজেই তথাকথিত গোয়েন্দা সংস্থার যে রিপোর্টে মানবাধিকার কর্মী এবং ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে সক্রিয়বাদী এক সাংবাদিকের নামে কুৎসা রটনা করা হয়েছে, তার পেছনে জামায়াতি ষড়যন্ত্র কার্যকর কি-না সেটাও যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। কারণ, পাঁচ বছরের বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনকালে জামায়াতিরা প্রশাসনের প্রায় সব অংশেই নীরবে প্রবেশ করেছে।
চার : আসলে এ অপশক্তি মূলত তারাই যারা ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনের বিরোধী, যারা বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক একটা পরিবেশে ফিরিয়ে নেওয়ার বিরোধিতা করছে। এ বিরোধিতা যে সরব তা নয়, কারণ উচ্চারিত সত্য হচ্ছে, ২০০৮ সালের ডিসেম্বর নাগাদ দেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার বদ্ধপরিকর। কিন্তু এ ধনুর্ভঙ্গপণ ভাঙাতেও তৎপর প্রশাসনের ভেতরেরই একটি অংশ। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, দ্রুত সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের আইন ও তথ্য উপদেষ্টা মইনুল হোসেন বললেন, ঘরোয়া রাজনীতি চালু করা নিয়ে সরকার এখনো ভাবছে। অথচ গোড়াতে মনে করা হয়েছিল, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ শুরু হওয়ার আগেই দেশে অন্তত ঘরোয়া রাজনীতি চালু হবে। এ রোডম্যাপটি যে সরকার অনুমোদন করেছিল সে কথা বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড শামসুল হুদাও। তিনি বরং কিছুটা হতাশাই প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার এ বিলম্ব দেখে। আর এ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হলে নির্বাচনী আইনে সংস্কার, রাজনৈতিক দলের সংস্কার সবই ব্যাহত হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিভাজন আনার এ চেষ্টাকে এক সময় বলেছিলাম বাঁদরের রুটি ভাগের ঘটনা। বাস্তবে ঘটছেও তাই-ই। এ ভাগাভাগিতে কে লাভবান হবে সেটা বলা মুশকিল কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশার জায়গাটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। কারণ সাম্প্রতিক এ গোলযোগ, এক ধরনের দুর্বল যৌক্তিকতা দিয়েছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরো কিছুদিন স্থগিত রাখার। তাতেই মনে হয়, যারা বর্তমান সরকারের 'এক্সিট প্ল্যান'-এর বিরোধিতা করছে সঙ্গোপনে, যারা দীর্ঘায়িত করতে চায় অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, তারাই সেই অপশক্তি। এই ঘরের শত্রু বিভীষণের বিরুদ্ধে যদি ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সরকার কঠোর অবস্থান না নেয়, তাহলে নির্বাচন বিলম্বিত হবে এবং সরকার বারবার বিচলিত বোধ করবে প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতার জন্য। আর সে ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন থেকে শুরু করে সরকারের সব ভালো পদক্ষেপও ব্যর্থ হবে। এ দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ না করলে বাংলাদেশের এ ব্যতিক্রমী তত্ত্বাবধায়ক সরকার আর দশটি অগণতান্ত্রিক সরকারের মতোই আস্থা হারাবে জনগণের। কাজেই এখনই সময় প্রকৃত অপশক্তিকে চিহ্নিত করে গণতন্ত্র নিশ্চিত করা। নইলে অপশক্তির অপব্যাখ্যায় ক্ষতবিক্ষত হবে গণতন্ত্র।

হ লেখক : আমেরিকা প্রবাসী সাংবাদিক ও কলামিস্ট